টাকাপয়সা বা তদারকির কোনও অসুবিধে হবে না। আপনারা বিল্ডিং কমিটিটা অ্যাপ্রুভ করে দিন।

সদানন্দ স্কুলের বিল্ডিং কমিটির জন্য নামগুলো এক এক করে পড়ে গেল। এ.আই, সেক্রেটারি, হেডক্লার্ক, বরুণ মণ্ডল আর পতিতপাবন সরকার। রাখহরিবাবুর নাম নেই।

সেক্রেটারি অবাক, সে কী মুখার্জিবাবু, আপনার নাম নেই?

সদানন্দ হাসল, তাই হয় নাকি? হেডমাস্টারকে তো থাকতেই হবে। এক্স-অফিসিও কনভেনার অফ দ্য কমিটি।

সকলকে হতভম্ব বানিয়ে সদানন্দ মিটিং শেষ করে দিল। পকেট থেকে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার একটা অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক বের করে সেক্রেটারি দীপকবাবুর হাতে দিয়ে বলল, ভাববেন না, যদি কিছু আরও লাগে, আমিই দেব। এস্টিমেন্ট আছে এক লক্ষ নব্বই-এর। সামান্য বাড়তেও তো পারে কাজের সময়। তাড়াতাড়ি কাজটা শুরু হয়ে যাক। আমার পক্ষে এই চেয়ারে বেশিদিন থাকা সম্ভব হবে না। চলে যাব।

... ...

সকলের সামনে চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে সদানন্দর খুব হালকা লাগছে। মিটিংয়ের পর শিক্ষকরা ছুটে এলেন, এটা কী বলছেন স্যার, তাই হয়?

আমরা আপনাকে যেতে দেব না। কিছুতেই না।

সদানন্দ হাসছে, কেউ চলে গেলে চেয়ার খালি থাকে না। যোগ্য লোক আসবেন। এস.এস.সি.-তেও রিকুইজিসান পাঠানোর ব্যবস্থা করছি আগে থেকেই। নতুন প্যানেল থেকে ক্যান্ডিডেট না পাঠানো পর্যন্ত পালাচ্ছি না।

টেলিফোনটা বেজে চলেছে বলে হাত তুলে সকলকে আশ্বস্ত করে সদানন্দ নিজের চেম্বারে ঢুকে গেল। রিসিভারটা কানে তুলে দেখল অমৃতা।

– কী মশাই, আজ রাতে আসছেন তো? আমি রেডি।

– আজ মানে?

– বাঃ, সেদিন বললাম না! বুধবার ভোরে বেরোব। শান্তিনিকেতন।

– যাঃ, কতগুলো কাজের ঝামেলায় একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এবারই যেতে হবে? পরের বার গেলেও তো হয়। ধরো, সামনের রোববার।

– এড়িয়ে যাচ্ছ?

– তোমাকে? কী যে বলো! এখনও স্কুলেই আছি।

– সে তো বুঝতেই পারছি। মানুষ বটে! একটা মোবাইল পর্যন্ত সঙ্গে রাখবে না। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে খুব ভাল্লাগে, না? স্বাধীন, একেবারে মুক্ত পুরুষ।

স্কুলের টেলিফোন থেকে এ সব কথার যোগ্য জবাব দেওয়া ঠিক হবে না। দরজার বাইরেই পতিতপাবনবাবু আর বরুণ দাঁড়িয়ে আছে। সংলাপগুলো সকলের কানে দেওয়ার মতো নয়। সদানন্দ সাবধান হল, তোমার সঙ্গে সন্ধেবেলা বুথ থেকে কথা বলছি।

অমৃতার হুকুম শোনা যায়, কোনও দরকার নেই কথা বলার। টাইমটেবিল দেখে নিলাম, চটপট করো। লালগোলায় পৌনে ছ'টায় ট্রেন। এখন সাড়ে চারটে। বেরিয়ে পড়ো। আরামসে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে যাবে। ট্রেন রাইট টাইমে থাকলে সাড়ে ছ'টাতেই এপারের জিয়াগঞ্জ স্টেশন। নদী পেরোনোর ঝামেলা নেই। আমি ট্রেনের খবর নিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

– দেখছি। বলে সদানন্দ একটু ভাবনার সময় চাইল।

অমৃতা কড়া গলায় বলল, দেখছি-টেখছি নয়, চলে এসো। চটপট।

রিসিভারটা রাখতেই হল, কারণ অমৃতা ওদিকে লাইন কেটে দিয়েছে। সব দিক দিয়েই বেশ জটিল পরিস্থিতি। কাল ভোরের মধ্যে বিশলাখিতে পৌঁছানোর আর কোনও ব্যবস্থা নেই। রাতের মধ্যে হাজির হয়ে গেলে আবার ... সারারাতের ক্লান্তি ও জাগরণের পর কাল গোটা দিনের জার্নির ধকল। গাড়ির মধ্যেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়তে হবে। অসুবিধে হয়তো হবে, কিন্তু সদানন্দ ডাকটা কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারছে না। চুম্বকের মতো এক টান।

স্কুল থেকে বেরিয়ে সদানন্দ লালগোলা যাওয়ার ঘাটের দিকে না গিয়ে ভ্যারাইটি স্টোর্সের কয়েন বুথে গিয়ে অমৃতার নম্বর ডায়াল করল।

– অ্যাই, একটু ভেবে দ্যাখো না। আজ আমি না গেলে কিছু হবে?

সব দিক দিয়েই বেশ জটিল পরিস্থিতি। কাল ভোরের মধ্যে বিশলাখিতে পৌঁছানোর আর কোনও ব্যবস্থা নেই। রাতের মধ্যে হাজির হয়ে গেলে আবার ... সারারাতের ক্লান্তি ও জাগরণের পর কাল গোটা দিনের জার্নির ধকল। গাড়ির মধ্যেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়তে হবে

– কিছু হবে মানে? তুমিই তো সেদিন বললে বুধবার তোমাদের ছুটি!

– হ্যাঁ, বুদ্ধপূর্ণিমার ছুটি দিয়ে চলে এলাম।

– ব্যাস, এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো ট্রেনে উঠে পড়ো।

– আরে না না, যদি কাল ভোরে বেরোই!

– চালাকি! কী করে পৌঁছবে এখানে? আমাদের ছ'টার মধ্যে বেরোতে হবে।

– মাঝরাতে বেরোব, যা হোক করে পৌঁছব। একটু অপেক্ষা কোরো।

– পাগলামি কোরো না। রাতে এলে ক্ষতি কী?

– গেলে তো রাত জেগেই থাকতে হবে সেদিনের মতো।

– অ। বুঝলাম। তাতে বুঝি খুব আপত্তি? এক রাতেই সন্ন্যাসী বনে গেলে!

– মোটেই নয়। তবে কাল সারাদিন যাওয়া আসা, অতখানি জার্নি।

– কিচ্ছু হবে না। আমি পারলে তুমিও পারবে।

– প্লিজ, আজ রাতটা একটু ঘুমিয়ে নিই। তারপর তো ...

– বেশ, তোমাকে পাশের ঘরে বিছানায় শুইয়ে তালা দিয়ে দেব। ঘুমিও যত ইচ্ছে। এখন ঝামেলা পাকিও না, চলে এস।

– তালাফালা ভেঙে ফেলব। পারব থাকতে? দাঁড়াও আর একটা কয়েন ফেলি, এক মিনিট হয়ে গেল।

– এবার এলেই হাতে একটা মোবাইল ধরাতে হবে। পারোও বটে। যাক গে শোনো, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো – ট্রেনটা মিস হয়ে যাবে।

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ সোমনাথ

রসেবশে

আমার গৃহিণী

জিকেল দে

কথায় বলে পুরুষ দু'রকম – বিবাহিত ও জীবিত। না, আমি জীবিত নই। আর পাঁচটা বাঙালি গৃহস্থামীদের মতো বিবাহিত পুরুষ। হাল আমলের স্লিমের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া স্ত্রী আমার জুটেছে বটে কিন্তু স্ত্রীর ঠোঁটের মতো কৃত্রিম রং মাখানো আমার জীবনও। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, ওই রঙিন ঠোঁট থেকে কত বেদবাক্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রতিদিন অনর্গল উচ্চারিত হয়। তবে আশার কথা এখনও কেউ বাবা বলে জীবনকে আরও রঙিন করে তোলেনি।

বিয়ের আগে টুকটাক কিছু লিখতাম। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় ছাপত কিছু কিছু। কিন্তু এখন? অবসরে লেখনী ধারণ করলেই গিন্নি অমুকবাবু কিংবা তমুকবাবুর উদাহরণ টেনে নিয়ে আসেন। বলেন, 'লিখে কী হবে? রবীন্দ্রনাথ তো কোনওদিন হতেও পারবে না। পাশের বাড়ির অনুর বাবার কাছে গিয়ে শেখো। চাকরির পাশাপাশি ইট-বালির ব্যবসা করে কেমন টাকা জমিয়েছে। শুনলাম কাল ন্যানো বুক করে এল। তুমি তো কিছুই পারলে না। খালি ওই মাস্টারগিরি।'

ভিতরে ভিতরে গিন্নির উপর রাগ জন্মালেও রাগটা গিয়ে পড়ল টাটাদের উপর। বাংলা ছাড়লেও বাঙালি বিবাহিত পুরুষের পিছু ছাড়েনি। আমার দু'লাইন লেখা কবিতার যমক, উৎপ্রেক্ষা, রূপকগুলো তখন সব এলোমেলো হয়ে যায়। সেলফের থেকে জয় গোস্বামী উঁকি দিয়ে বলেন, 'আপনার ভ্যালিডিটি ফুরিয়ে গিয়েছে। দ্রুত রিচার্জ করুন।'

সংসার নামক বাস্তুতন্ত্রে আমিই একমাত্র উৎপাদক। আর আমার গিন্নি প্রাথমিক, গৌণ, প্রগৌণ ও সর্বোচ্চ খাদকের ভূমিকা নিয়েছেন। মাসের এক তারিখ থেকে পাঁচ তারিখ পর্যন্ত সংসারে আমার গুরুত্ব যে কিছুটা হলেও বাড়ে তা যুক্তি দিয়ে অনুভব করি। তার নেপথ্যে অবশ্যই কারণ আছে। বাঁকা আঙুলে ঘি ওঠার আগে সোজা আঙুলে আমার সমস্ত পুঁজি ভালো স্বামীর মতো গিন্নির হাতে তুলে দিতে হয়। গিন্নির দাবি, অঙ্কে কাঁচা হলেও আর্থিক লেনদেনের অঙ্কটা উনি খুব ভালোই বোঝেন। অফিসের বড় বাবুটি থেকে শুরু করে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাটি কেন টেবিলের তলা দিয়ে অতিরিক্ত নোটগুলি নিজের পকেটে গুছিয়ে নেন, তার কারণটা তখন আর অজানা থাকে না।

আমার সহধর্মিনীটির সঙ্গে সংসার ধর্ম শিক্ষা নিতে গিয়ে বেকায়দায় পড়তে হয়েছে অনেক। দু'টি ঘটনা আপনাদের বলি।

বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে আমার শাশুড়িমাতা নতুন বাইকের চাবি আমার হাতে তুলে দেন, সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করি বলে। একে সৌভাগ্য বলব না দুর্ভাগ্য বলব তার মূল্যায়নের ভারটা পাঠকের হাতেই তোলা থাক। নম্বর প্লেটের পাশাপাশি নতুন গাড়ির সামনে লাল তুলির টানে লিখিয়ে আনলাম 'মায়ের আশীর্বাদ'। দোকান থেকে গাড়ি ঘরে ঢোকাতেই গিন্নির মেজাজ সপ্তমে। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওটা এক্ষুনি খুলে আনতে হবে। পরিবর্তে লিখিয়ে আনতে হবে 'শাশুড়ির আশীর্বাদ'। নতুবা ওই গাড়ির চাবি আমার ছোঁয়া বারণ। প্রতিবাদ করলাম না। পরদিন গিন্নির নির্দেশমতো 'শাশুড়ির আশীর্বাদ' লিখিয়ে আনলাম ঠিকই তবে ওই গাড়ি আমার গ্যারেজ ঘরেই তোলা আছে। আমার সাইকেল জিন্দাবাদ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি বিয়ের আশীর্বাদে পাওয়া সোনার চেনকে ঘিরে। সেটাও অবিশ্যি শাশুড়ি মাতারই দেওয়া। বিয়ের পর পর নবদম্পতি এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছি। গলায় ঝুলিয়েছি শাশুড়ির আশীর্বাদ। খেতে বসে হঠাৎ বন্ধু জিজ্ঞেস করে বসল, 'তোর গলায় সোনার চেন! তুই তো এগুলো পরতিস-টরতিস না।'

আমার গিন্নি পাশের থেকে দন্তের সুর চড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'আমার মা-র দেওয়া কিনা।'

বিদ্রোহ করলাম না। বন্ধুর বাড়ির নিমন্ত্রণের অন্নটুকু কোনওমতে জল দিয়ে গিলে নিঃশেষ করলাম। মাঝে মাঝে মনে হয় সম্মুখেই বিদ্রোহ ঘোষণা করি। আর কত সহ্য হয়! না হয় জেলেই গেলাম। জেলের হাওয়া বোধ করি এর চেয়ে ঢের ভালো।

সেই তিনবছর যাবৎ শুধুই আপস। কিগো, হ্যাঁ গো শব্দগুলো মাঝে মাঝে জোটে বটে, তবে তাতে আবেগের পরিমাণটা নেই বললেই চলে। পরিবর্ত শব্দগুলোর পিছনে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা জ্বলজ্বল করে বেশি। বিয়ের আগে বেকার জীবনেও এত দুঃস্বপ্ন দেখিনি। যতটা আজ দেখি, এই তো সেদিন রাতে, সবে একটু তন্দ্রা এসেছে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আমার মুখোমুখি স্বয়ং যমদূত। তাঁর সঙ্গে স্বপ্নে কাব্য করে যে কথা হল তা এইরকম –

সকাল সকাল যমদূত আমার বাড়িতে এল
এসে আমার দরজায় নাড়া দিল
আমি দরজা খুললাম যেই
যমদূত বলা শুরু করল সেই –
'কবিভাই, আপনার প্রাণটা আমি চাই জাস্ট'

আমি আমার স্ত্রীকে দেখিয়ে বললাম, 'এখন তো লেডিজ ফার্স্ট'।

যমদূত আমার স্ত্রীকে দেখে বলল,
'আমি তো একে দেখেই ভয় পাচ্ছি'
আমি বললাম, 'হে যম
আমি তো দু'বছর যাবৎ এর সঙ্গেই সংসার করে যাচ্ছি।'

যাওয়ার সময় যমদূত আমাকে আবার বলল –
'তুমি যে কেমন করে এর সঙ্গে ঘর করো!
তোমাকে আর নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই,
তুমি এর সঙ্গে সংসার করেই মরো।'

পাঠকেরা হয়তো ইতিমধ্যেই অভিযোগের তর্জনী আমার দিকে তুলে ধরেছেন – আমি স্ত্রীবিদ্বেষী। না হে, আমি স্ত্রীবিদ্বেষী নই। আসলে সস্ত্রীক জীবনযাপনের কিছু দুঃখ তুলে ধরলাম। যদি কিছুটা হালকা বোধ করা যায়। তবে আজ এখানেই থাক। গিন্নির ছাদ থেকে ফিরে আসার সময় হল বলে। টাইমিংটা মিস করলে বোল্ড হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবে এই কাহিনির উপসংহারে আমার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া আর কিছুই লেখার নেই। কারণ লেখাটা কোনওমতে গিন্নির চক্ষুগোচর হলে লুকিয়ে লেখার সুযোগটাও হয়তো থাকবে না। বাংলার অবিবাহিত সকল জীবিত যুবাপুরুষকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আপামর পাঠকবৃন্দকে বলে রাখি – হয়তো এখানেই শেষ।

অঙ্কন ঃ অভি